যুগান্তর

যুগান্তর

তারিখ 15 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শরীফুজ্জামান আগা খান

এমপিওভুক্তির অনিশ্চিত বছর গণনা

কাজের সঙ্গে মজুরির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কোন ব্যক্তি কাজ করলে মজুরি পাবেন এটাই নিয়ম। স্বল্প সময়ের কাজের বিনিময় অক্ষণিকভাবে এবং দিনমজুরের কাজের মূল্য দিনান্তে পরিশোধ করা হয়। কেউ কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করলে মাস শেষে বেতন পান। শিক্ষানবিসকালে কিংবা মাস্টাররোলের কিছুটা ব্যত্যয় হতে পারে। এ সময়কাল বড়জোর কয়েক মাস। এর পর যথারীতি বেতন চালু হয়।

লক্ষাধিক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি বছরের পর বছর চাকরি করছেন অথচ কোন বেতন পান না। কবে বেতন হবে সেই আশায় দিন গুনে চলেছেন। এভাবে একটা যুগই পার হয়ে গেছে। তারপরও বেতনের কোন খবর নেই। আরও কত বছর পেরোলে বেতন হবে তাও অজানা। সে এক অনিশ্চিত দুঃসহ জীবন। রোজগেরে কোন ব্যক্তির কাছে ব্যাপারটি বিস্ময়কর মনে হবে। বাস্তবে এমনটিই ঘটে চলেছে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে।

মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের এমপিওভুক্ত নিম্ন মাধ্যমিক-মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরি ও মাদ্রাসার মতোই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো একই নিয়ম-রীতিতে পরিচালিত হয়। এই দুই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারীরা একই রকম শ্রম দেন। অথচ পরিহাসের বিষয়, প্রথমোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকার থেকে শতভাগ বেতন-ভাতা পান। কিন্তু শেষোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা কিছুই পান না।

মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে অনেক শর্ত পূরণ করতে হয়। এর ভেতর প্রতিষ্ঠানের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ নিজস্ব জমির ব্যবস্থা, চারদিকে নির্দিষ্ট দূরত্ব অবধি সমজাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি না থাকা, সন্নিহিত এলাকার জনসংখ্যার হিসাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ব্যাংকে সঞ্চিত তহবিলের হিসাব খুলে সেখানে বড় অংকের টাকা গচ্ছিত রাখতে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণের পর শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ এবং ছাত্রছাত্রী ভর্তি করানোর পর প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করার পর শিক্ষা বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট দফতরে পরিদর্শনের আবেদন করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে পরিদর্শক নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। অধিকাংশ শর্ত পূরণ হলে পাঠদানের অনুমতি মিলে। সাধারণত এই অনুমতিকাল তিন বছর। অনুমতিপত্রে অপূরিত শর্ত পূরণের তাগিদ থাকে। যেমন— কোন শিক্ষকের বিএড না থাকলে এ মেয়াদে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে বলা হয়। পাঠদানের অনুমতি নেয়ার সময় সরকারি বেতন-ভাতা না চাওয়ার লিখিত অঙ্গীকার করা লাগে। প্রাথমিক অনুমতিকাল সফলভাবে অতিবাহিত হলে আবারও পরিদর্শনের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি মেলে। আর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হবে সেটাই রীতি। নতুন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানকালে শিক্ষক-কর্মচারীরা প্রাথমিক অনুমোদনকালে বেতন-ভাতা না পাওয়ার মানসিকতা নিয়ে চাকরিতে যোগ দেন। তারা আশায় থাকেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি পেলে এমপিও মিলবে। তখন পেশাগত জীবনের অনিশ্চয়তা দূর হবে। এর আগে স্বীকৃতির সময় থেকে বেতন-ভাতা চালু হয়ে এসেছে। আর যদিবা স্বীকৃতির কয়েক মাস পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে সেক্ষেত্রে এরিয়ারসহ বেতন-ভাতা পাওয়া গেছে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বছরের পর বছর পার করলেও এখন আর এমপিওভুক্ত হচ্ছে না। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তহীনতার কারণে এসব প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নিয়ে ঘোরতর সংশয় দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এ নিয়ে তেমন কোন মাথাব্যথা নেই। বিগত চারদলীয় জোট সরকারের ক্ষমতার শেষ মেয়াদে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওভুক্তির আশা করেছিল; কিন্তু সেটা ঘটেনি। এর পর দুই বছর মেয়াদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ঘরেক তাদের এ সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির বিষয়ে ভাবার ফুরসত পায়নি। বর্তমান মহাজোট সরকারের প্রতিবছর এমপিও দেয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল। কিন্তু ২০১০ সালে সংশ্লিষ্ট বোটারি দৃষ্টিকোণ থেকে মাত্র একবার এক হাজার ৬২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করে। এর পর আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি খাতে বাজেট রাখা হয়নি। যে কারণে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এ সরকারের আমলে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিও করা না হলে পরবর্তী সরকারও সহসা এমপিও নিয়ে ভাববে বলে মনে হয় না। ইতোবসরে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একে একে বন্ধ হয়ে যাবে।

অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার শিক্ষক-কর্মচারীরা অগত্যা অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজপথে নেমেছেন। নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের ব্যানারে ছয় মাস ধরে চলা এই আন্দোলনের সময় শিক্ষামন্ত্রী ও সচিবের সঙ্গে শিক্ষক নেতাদের পাঁচবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ ২৩ সেপ্টেম্বরের বৈঠকে এমপিওভুক্তির বিষয়ে শিক্ষা সচিবের সুখবর জানানোর কথা ছিল। কিন্তু তিনি কোন কিছু করতে না পারায় শিক্ষক-কর্মচারীরা আবারও পহেলা অক্টোবর থেকে লাগাতার আন্দোলনে নামেন। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হবে এটাই নন-এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের মূল দাবি। এ দাবির পরিপূরক হিসেবে স্বীকৃতির সময় থেকে চাকরির বয়স গণনা, সংসদ সদস্যদের ডিও লেটার প্রথা রহিত, এমপিও প্রদানের অনিয়ম ও দুর্নীতি বন্ধ এবং স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনুমোদন স্থগিত রাখা; এই চারটি দাবি এসেছে। সর্বশেষ এই আন্দোলনের চতুর্থ দিনে পুলিশ শিক্ষক-কর্মচারীদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। এতে অর্ধশতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী আহত হন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে দুই-এক দিনের ভেতর বৈঠকের প্রস্তাব এলে কর্মসূচি সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের আশা, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক হলে এমপিওভুক্তির সুরাহা হবে। দুঃখের বিষয়, এক মাস পেরিয়ে গেছে অথচ এখনও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বৈঠকের দিনক্ষণ নির্ধারণ করা হয়নি।

শিক্ষামন্ত্রী এবং সচিবের সঙ্গে বৈঠককালে শিক্ষা খাতে ঘাটতি বাজেটের কথা বলে আমাদের এমপিওভুক্তির অধিকার পাস কাটানোর প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বৈঠকে আন্দোলনরত শিক্ষক সংগঠনের পক্ষে এমপিওভুক্তি খাতে বাজেট বরাদ্দ কম হলে কম বেতন নেয়ারও প্রস্তাব করা হয়। এমনটিও জানানো হয়, এ বছর ৫০% বেতন দিন। পরবর্তী বছর বেতন ১০০%-এ উন্নীত করুন। সদিচ্ছা থাকলে সরকার চলতি ক্ষমতা মেয়াদে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করতে পারে।

উদ্বেগের বিষয় হল, অর্থ ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির অধিকার প্রশ্নবিদ্ধ করতে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনসংখ্যার নিরিখে বাড়তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাবলিক পরীক্ষায় খারাপ ফলাফল করা কিংবা স্বল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী রয়েছে এমন এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ টানতে দেখা যায়। প্রকারান্তরে তাদের ধারণা, এমপিও প্রত্যাশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও বুঝি নিয়মনের। এক্ষেত্রে বলা দরকার, একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির মেয়াদ থাকে ২-৩ বছর। এর পর প্রতিষ্ঠানের সার্বিক রূপ মূল্যায়ন করে তবেই আবার স্বীকৃতি নবায়ন করা হয়। এখন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল যদি একান্তিকভাবে খুবই খারাপ হতে থাকে কিংবা শিক্ষকের সংখ্যা শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছাপিয়ে যায় তবে ওই ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি আটকে দেয়ার ভেতর দিয়েই ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব। কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকার মতো বাস্তবতা না থাকলে ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের পার্শ্ববর্তী বড় কোন প্রতিষ্ঠানের (সমূহের) অঙ্গীভূত করে ফেললে তাতে কেউ আপত্তি করবে না। বিনা বেতনে অতিকষ্টে বছরের পর বছর সফলতার সঙ্গে হাল ধরে থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হলে শিক্ষার মান যে আরও বাড়বে সে কথা না বললেও চলে।

এ সরকারের নির্বাচনী একটি প্রতিশ্রুতি ছিল, প্রতিটি পরিবারে অন্তত একজন সদস্যের চাকরির ব্যবস্থা করবে। স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষক-কর্মচারীরা নিজ যোগ্যতাবলে এক রকম কর্মসংস্থান করে নিয়েছেন। ইতিমধ্যে তারা পেশাগত নানা ধরনের প্রশিক্ষণও নিয়েছেন। এখন সরকারের কর্তব্য হবে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করে সত্যিকার চাকরি কার্যকর করা।

বিস্ময়ের ব্যাপার হল, এমপিওভুক্তি খাতে অর্থের অভাবের কথা বলা হলেও শিক্ষার নানান ক্ষেত্রে বড় ধরনের বরাদ্দ থেমে নেই। সরকার ২৬ হাজার রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দফতরি নিয়োগ হতে যাচ্ছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩৯ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধিসহ নানা আর্থিক সুবিধা দেয়ার সরকারি প্রক্রিয়া চলছে। অথচ যারা বিনা বেতনে একযুগের অধিককাল চাকরি করছে, তাদের ব্যাপারে সরকারের কোন ভাবনা নেই। একদিকে বিনা বেতন, অন্যদিকে অসম্মানের দুঃসহ এক জীবন। আমরা পরিবারে করুণার পাত্র, সমাজে উপেক্ষিত, জীবন চলার পথে পদে পদে বিড়ম্বিত। এরকম দুরবস্থা দেখে আমাদের সন্তানাদি এবং ছাত্রছাত্রীরা জীবনে আর যাই হোক শিক্ষক হতে চাইবে না।

যদি সরকার স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত না-ই করতে চায়, তবে দয়া করে যেন 'নতুন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হবে না' মর্মে গেজেট আকারে একটি ঘোষণা দেয়। এতেই আমাদের ভীষণ উপকার হবে। তখন আর মিছে আশায় অযথা এমপি, মন্ত্রীদের পিছে পিছে ঘুরে মরতে হবে না। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিনা বেতনে চাকরির পাশাপাশি জীবিকার প্রয়োজনে শিক্ষক-কর্মচারীদের পার্টটাইম কোন না কোন কাজ করতে হয়। সেখান থেকে উপার্জিত অর্থে কোনরকমে কাজেক্লেশে দিন চলে। এই বিড়ম্বনাকর চাকরি চলে গেলে সেই পেশায় পুরোপুরি মনোনিবেশ করা যাবে। তখন কিছুটা হলেও আর্থিক সচ্ছলতা আসবে। বিনা বেতনে চাকরির অপবাদও দূর হবে।

অনেক শিক্ষক-কর্মচারীই ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বের এই অনিশ্চিত জীবন ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছেন। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখার দায়বদ্ধতা, অন্যদিকে ম্যানেজিং কমিটি এবং অভিভাবকদের আঁকড়ে ধরে রাখার কারণে বের হয়েও আসতে পারছেন না। স্থানীয় জনগণও অচিরেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত হবে এই সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন। এ রকম পরিস্থিতিতে সরকারের কাছে বিনীত নিবেদন, একটা সিদ্ধান্তে আসুন। হয় অবিলম্বে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করুন, নইলে আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হবে না— মর্মে একটি ঘোষণা দিন।

শরীফুজ্জামান আগা খান : নন-এমপিও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক